

হায়দার, এক সফল তরুণ
স্বপ্নের ডানায় ভর দিয়ে...

কাজী জহিরুল ইসলাম



বেকারত্বের হতাশায় যখন তরুণ সমাজ নিমজ্জিত তখন কোন কোন উজ্জ্বল তরুণ স্বপ্নের ডানায় ভর দিয়ে পৌছে যায় অভীষ্ট লক্ষ্যে। তাদের সাফল্যের গল্প আমাদের উজ্জীবীত করে, আমরা স্বপ্ন দেখি। আমাদের স্বপ্নগুলোরও ডানা গজায়, আমরাও উড়াল দিই। এমনি এক সফল তরুণ তৌফিক হায়দার চৌধুরী। ১৯৮০ সালে চট্টগ্রামে জন্ম হায়দারের। সরকারী চাকুরে বাবা, স্কুল শিক্ষিকা মা আর তিন ভাইয়ের আটপৌরে মধ্যবিত্ত জীবন কখনোই আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখেনি। ‘বাসায় অতিথি এলে, মা আমাকে চা বানাতে বলতেন। আমি একই পাতা বারবার ব্যবহার করে চা বানাতাম। মামা ধমক দিতেন, এত কৃপন হয়েছিস কেন?’ অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণেই হায়দারের মতো অনেক কোমলমতি তরুণের মধ্যে এরকম কোপন স্বভাব তৈরী হয়।

চট্টগ্রামের ইম্পহানী পাবলিক স্কুলে পড়তে পড়তে হায়দার সারাক্ষণ ভাবতো কিভাবে দারিদ্র দূর করে বাবা মা’র মুখে হাসি ফোটানো যায়। ‘মনে হতো যদি কোন অলৌকিক উপায়ে অনেকগুলো টাকা পেয়ে যেতাম, তাহলে মার হাতে তুলে দিতাম। এভেগুলো টাকা পেলে মা’র মুখ নিশ্চয়ই খুশিতে ঝলমল করে উঠবে। আনন্দে উদ্ভাসিত মায়ের সেই হাসিমুখ দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি’। তখন ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। প্রখ্যাত লেখক আবুল ফজল ও মাহবুবুল আলমের নাতিরা ওর সহপাঠি। ওদের বিখ্যাত দাদা, নানার গল্প শুনে হায়দারের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে। অনেক বই পড়ে সে। সুনীলের বই, সমরেশের বই, শীর্ষেন্দুর বই, হুমায়ূনের বই। পড়তে পড়তে সে হারিয়ে যায় দেশ-বিদেশের স্বপ্নময় শহরে, পাহাড়ের ভেলিতে, সমুদ্র সৈকতে। মনে হয়, বিদেশে যেতে পারলেই ঘুচে যাবে সংসারের সব দৈন্যতা। ছুট করে একদিন ওর বন্ধু রবি (মাহবুবুল আলমের নাতি) বাবা মার সাথে কানাডায় চলে যায়। দারিদ্র, বইয়ে পড়া ভ্রমণবিলাসী মন আর রবির বিদেশে যাওয়া, এই ত্রিমুখী ভাবনার স্রোতধারা ওর মধ্যে বিদেশে পাড়ি জমানোর সংকল্প তৈরী করে।

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র হায়দার টিউশনি করে পড়ার খরচ যোগায় আর সারাক্ষণ ভাবে কি করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়া যায়। পাশ করার পর পাগলের মতো রবির ঠিকানা খোঁজে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই, হায়দারও রবির ঠিকানা পেয়ে যায়। চিঠি লেখে। চিঠির জবাবও আসে। সাথে কানাডার কুডিট বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা। হায়দার লিখতে শুরু করে। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই জবাব আসে। কিন্তু এতো হাজার হাজার ডলার পড়ার খরচ ও কোথেকে পাবে? কানাডায় যাওয়ার স্বপ্ন ডিমের খোসার মতো মুড়মুড় করে ভেঙে যায়।

একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে মা ওর হাতে একটি খবরের কাগজ তুলে দেন, ভোরের কাগজ। হায়দার দেখে চীন সরকার বাংলাদেশের ৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে চীনে পড়ার জন্য বৃত্তি দেবে। আবেদন করতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, কম্পিউটারাইজড ফরমে। এজন্য টাকা লাগবে। কিন্তু ওর কাছেতো টাকা নেই। বাবা ১৩৫ টাকা দিয়েছিলেন খবরের কাগজের বিল পরিশোধ করার জন্য। সেই টাকা নিয়ে হায়দার ছোট্ট কম্পিউটারের দোকানে।

একমাস পরে ঢাকার নায়েম-এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। হায়দার ফোন করে ওর এক বন্ধুকে। বন্ধু জানায়, প্রতিযোগিতামূলক এই বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে ২০০ জন শিক্ষার্থী, হায়দারও তাদের একজন। হায়দার ছোট্ট ঢাকায়। এক’শ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। চীন দূতাবাসের এক চীনা কর্মকর্তা প্রশ্নপত্র দিয়ে নাকিসুরে বলেন, ‘ঠুমরা থাড়াছড়া করবে না। আস্তে আস্তে লিখবে। আর কেউ অ্যামব্যান্সিতে যোগাযোগ করবে না। যারা নির্বাচিত হবে আমরা খাদের কাছে ছিটি পাঠাবো।’

ছিটি আর আসে না। আবারও হতাশার অতল গহবরে নিমজ্জিত হতে থাকে হায়দার। প্রায় দুই মাস পরে হঠাৎ একদিন টেলিফোন আসে। শুরু হয় চীনে যাওয়ার প্রস্তুতি। ‘চীন দূতাবাস থেকে আমাদের একটি ৫০০ পৃষ্ঠার লাল বই দেয়। ওতে শত শত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অপূর্ব সব ছবি। আমি দেশটির উত্তরাংশে অবস্থিত ঠান্ডা অঞ্চলের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লিখি। যেখানে শীতকালে তুষারপাত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই দেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত হুনান প্রদেশের সেন্ট্রাল সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঠিক এর পাশেই হুনান বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মাউ জে ডুং পড়েছেন।’

হায়দার ও তার অন্য তিন সঙ্গী ১৯৯৮ সালের ৩০ আগস্ট উড়াল দেয় চীনের উদ্দেশ্যে। হংকং হয়ে পরদিন বেইজিং। চারদিন পর ১৬ ঘণ্টার ট্রেনে চড়ে হুনান প্রদেশে। পথে শিয়াং জিয়াং নদী। নদীর ওপারে ইয়েলু পাহাড়। ইয়েলু পাহাড়ের পাদদেশেই পাশাপাশি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। একটি সেন্ট্রাল সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আর অন্যটি হুনান বিশ্ববিদ্যালয়। চীনের হুনান প্রদেশে জনগ্ৰহণকারী সমাজতন্ত্রের গুরু মাও জে ডুং এই ইয়েলু পাহাড়েই নিয়মিত দৌড়াতেন।

আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে হায়দারের থাকার ঘর। ওমা, এ যে বিদেশী সিনেমায় দেখা ছবির মতো সাজানো ঘর। স্বপ্নপূরণের আনন্দে আত্মহারা হায়দার কাঁদতে শুরু করে। ওর কেবলি ইচ্ছে হয় এই আনন্দাশ্রু সবাইকে দেখায়, বাবাকে, মাকে, ভাইদের, বন্ধুদের। সমস্ত কৈশোরজুড়ে এই স্বপ্নইতো ও দেখেছিল। প্রথম বছরে শেখানো হয় চীনের সুকঠিন ভাষা। এরপর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চার বছরের ম্নাতক ডিগ্রী। ভাল ফলাফল, সর্বোচ্চ হাজিরা এবং অনুকরণীয় আচার-ব্যবহারের কারণে না চাইতেই মাস্টার্সের বৃত্তি পেয়ে যায় হায়দার। আবারো তিন বছরের দৌড়।

মাস্টার্স করতে করতেই চাকরীর জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠে ও। বিশ্ববিখ্যাত টেলিকমিউনিকেশন্সের ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক নির্মাণকারী কোম্পানী ‘হুয়াওয়ে’-র ক্যাম্পাস রিক্রুটিং টিম আসে। CISCO নেটওয়ার্কিং-এর ওপর লিখিত পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা হয় চীনে ভাষায়। স্থানীয় ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতা করে হায়দার টিকে যায়। এরি মধ্যে পিএইচডির বৃত্তিও জুটে যায়। কিন্তু হায়দার সিদ্ধান্ত নেয়, অর্জিত বিদ্যা পেশাগত জীবনে কাজে লাগিয়ে নিজের এবং পরিবারের অর্থনীতির চাকাটি আগে সচল করা দরকার। পিএইচডি পরেও করা যাবে। হুয়াওয়ে-তে যোগদানের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে তাড়াহুড়ো করে মাস্টার্সের থিসিস জমা দিয়ে ছোট্ট শেনজেন শহরে, হুয়াওয়ের সদর দফতরে। শুরু

হয় নতুন জীবন । দশদিনের বুটক্যাম্প ট্রেনিং । চীনে ভাষার ওপর পূর্ণ দখল থাকার কারণে হায়দার নিয়োগ পায় চীনে স্টাফ হিসেবেই । সদর দফতরে দু’মাস কাজ করেই সে তার কর্মদক্ষতা দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় ।

চীনে এবং ইংরেজী এই দুই ভাষাতেই পূর্ণ দখল থাকায় ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নেয় হায়দারকে আন্তর্জাতিক নিয়োগ দেবার । মাত্র দু’মাসের মাথায় প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে হায়দার যোগদান করে ছ্যাওয়ের ঘানা অফিসে । দায়িত্ব নেয় ফাইবার অপটিক প্রকল্পের । ৫ মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ করে ছোট্ট নাইজেরিয়ায়, দুমাস পরে আবারও ঘানা । এরপর আইভরিকোস্ট । গত এক বছরের কিছু বেশী সময় ধরে হায়দার আইভরিকোস্টের রাজধানী আবিদজান শহরে অবস্থান করছে । ছ্যাওয়ের একটি চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প কমিয়ামের দায়িত্বে আছে হায়দার । নিরলস কাজ করে যাচ্ছে প্রকল্পটিকে সফল করার জন্য ।

আইভরিকোস্টে ছ্যাওয়ের আশিজন আন্তর্জাতিক কর্মীর মধ্যে একমাত্র হায়দারই বিদেশী । বাকী সবাই চীনে স্টাফ । পেশাগত দক্ষতা, অনর্গল চীনে এবং ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে পারা ও লিখতে পারার দক্ষতাই হায়দারকে আজকের এই অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে ।

হায়দার মনে করে, কোন কিছুই অসম্ভব নয় । সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিটি মানুষের উচিত স্বপ্ন দেখা । তরুণদের উচিত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া । এ্যারোপ্লেনের ডানায় ভর না দিলে নিজের ডানা গজায় না । আর একমাত্র উড়াল দিয়েই সবচেয়ে বেশী পথ পার হওয়া যায় ।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮